নতুন দিগন্তের স্বপ্ন

সালেহা চৌধুরী

(নতুন দিগন্ত— প্রথম খণ্ড)

নতুন দিগন্তের স্বপ্ন কেবল আবদুর রউফ চৌধুরী একা দেখেননি। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাহিত্যের দিকপাল, নগন্য, মহামান্য, স্বল্প পরিচিত, বিখ্যাত অনেকেই বিভিন্ন ভাবে এই দিগন্তে পৌঁছে যাবার কথা বলেছেন; কিম্বা বলা যায় এক নতুন দিগন্ত তৈরী করবার স্বপ্ন দেখেছেন। প্রথমেই মনে পড়ে যায় আলাউদ্দিন আল আজাদ, জহির রায়হান প্রমুখ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অগনিত; এই আরো অগনিতের মধ্যে তারাশঙ্কর এবং তাঁর 'ধাত্রি দেবতা', 'গন দেবতা' ও 'আরোগ্য নিকেতন' মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ', 'অরক্ষনীয়া' প্রভৃতি কলমচাষের ফসল। যারা ভেবেছেন এই সমাজের, এই পৃথিবীর, এই গ্রহের পরিবর্তন আশ্বস্যম্ভাবী তাদের লেখার কথা। যখন 'দুইবিঘা জমির' উপেনের মতো সকলেই দার্শনিক হতে পারে না; কি হয় তাদের? যারা বাবুর কথায় সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বিশ্বভ্রমণে বের হ'ন না, যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন পরিবর্তন আনতেই হবে; না হলে এই পৃথিবী একদিন শেষ হয়ে যাবে। আবদুর রউফ চৌধুরীর মধ্যে যেটুকু স্বতন্ত্র্য আমি দেখেছি তাঁর 'নতুন দিগন্ত', প্রথম খণ্ড পাঠ করবার পর, সে হলো তিনি যাদের পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেছেন তাদের কথা না বলে প্রথমেই শুরু করেছেন সেইসব মানুষের কথা দিয়ে যারা এই পরিবর্তনের পথের সবচেয়ে বড় বাধা। সবচেয়ে বড় শিখণ্ডী। এরা কারা? এরা রাজনীতিবিদ, আমলা, জমিদার, সুবিধাবাদী, ভোগবিলাসী— গলিত সমাজের স্থবির গলিত মানুষ। যাদের কথা ভেবে ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বলেছিলেন, 'হাজার শালকা এক বুড্ডা মর গিয়া/ ধুমধাম সে উসে দাফন কর।' পুঁজিবাদের গলিত বৃদ্ধ এই পংক্তির বিষয়।

না এরা কেউই শারীরিক ভাবে স্থবির ও গলিত নন। এরা কেউ মহাস্থবির জাতকো নন্। এরা সুস্থ সবল ভোগবাদী, সুবিধাবাদী— আমাদের সমাজের বিশেষ পরিচিত কিছু মানুষ। আবদুর রউফ চৌধুরী চলে গেছেন সুদূর পাকিস্তানে এবং সেখান থেকেই এই উপন্যাসের শুরু। আর যে মানুষটিকে তিনি প্রথমেই আমাদের সামনে হাজির করেছেন তিনি হচ্ছেন ভুট্টো। এ কোন ভুট্টো? একি সেই চেনা জুলফিকার আলি ভুট্টো? একি লারকানার জমিদার? একি পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক প্রতিনিধি? বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী? হতেও পারে, নাও পারে। পুরাতন জরাজীর্ন সমাজের কথা বলতে গিয়ে যে ব্যাক্তি আমাদের সামনে হাজির হ'ন তিনি সেইসব মানুষের একজন; যাকে আমরা সকলেই চিনি। এবং এইকারণে ভুট্টোকে খুব বেশি করে পরিচিত করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। নামই যথেষ্ট। আমরা প্রথম থেকেই তাঁকে অপছন্দ করি এবং ঔপন্যাসিকের কাজ সহজ হয়ে যায়। তিনি বলতে চান এই প্রকার ভুট্টোর মতো লোক যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে যে কোনো পরিবর্তনই বাধাগ্রস্থ হবে। যদিও ভুট্টো তাঁর লেখায় জুলপি আলি ভুট্টো নামে পরিচিত।

সিন্ধুর জমিদার, লারকানার ও বাংলাদেশের জমিদার বা পুঁজিবাদী মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য নেই। যুগে যুগে জমিদারের চেহারা একই প্রকার। আর যারা প্রজা তারাও একই মতো, মানুষ নামের মানুষ শরীর। প্রথমে যদিও ভুট্টোকে প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত করেন, কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা তাঁর স্বরূপ দেখতে পাই। ভুট্টোকে আমাদের খারাপ লাগে। লেখক অত্যন্ত দক্ষতায়

সঙ্গে ভুট্টোর প্রতি আমাদের মন বিরূপ করেন। আমরা এই অসহ্য মানুষটিকে পাতার পর পাতায় পড়তে গিয়ে বিরূপ হয়ে উঠি। তাঁর বিবিধ কার্যকলাপে বিরক্ত হই। ভাবি এমনি একজন এবং এমনি অনেকজনই আমাদের সমাজে শিখণ্ডীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে দিতে চান না। ভোগবিলাসে ডুবে যারা কষ্টের পথ হাঁটছেন তাদের দিকে ফিরেও তাকান না। সত্যিকারের ভুট্টোর দুটো স্ত্রী ছিলো, তা আমরা জানি। আর এই উপন্যাসের ভুট্টোর তিনটি স্ত্রী এবং অগনিত কংকাবইন। এবং কিছু বান্ধবীও বর্তমান। অর্থাৎ কিছু রমণীর শরীরের সুগন্ধ। যার মধ্যে বাড়ির পরিচারিকা আন্নীও বাদ পড়ে না। এমনকি আয়ূব খুরোর স্ত্রী সুরাইয়াও না। যার ভয়াবহ কামনায় বলি হয়ে ভুট্টো বেঁচে থাকে। এবারে দেখা যাক আবদুর রউফ চৌধুরীর স্বপ্ন কি? তিনি নতুন দিগন্ত বলতে কি বোঝেন?

> নাসিম দিব্যচোখে দেখতে লাগলো সারা বৃহত্তর বাংলা দেশে বিপ্লব শুরু হয়েছে; নতুন দেশ জন্ম নিচ্ছে— বৃহত্তর বাংলা দেশ, মুর্শিদাবাদ তার রাজধানী, কলকাতা ও ঢাকা দুটি বৃহত্তর শিল্পনগরী; রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতাকে অধ্যয়ন করে যুগোপযোগী সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে, যে-ব্যবস্থায় শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রমকারী মানুষের অধিকার থাকবে ব্যাপক; অধিকন্তু সর্বহারা বিপ্লবের গুণগুলো— সর্বজনীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক আদর্শ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। জনগণকে দৃঢ়ভাবে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ও পুঁজিবাদী প্রভাবসমূহের মোকাবিলা করতে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে প্রগতিশীল পন্থা এবং বিজ্ঞানসম্মত ও প্রযুক্তিশীল শিক্ষাব্যবস্থা। এই নতুন ব্যবস্থায় কোনও শ্রেণী ভেদাভেদ নেই। বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়ে মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আশার সঞ্চার উপলব্ধি করে আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতেই এ নতুন দেশ অমূল্য অবদান রাখছে। এ-দেশের সেনাবাহিনী শৌর্যশালী ও রণ পরীক্ষিত গণমুক্তি ফৌজ বলে অভিহিত হচ্ছে; দেশের সমাজতান্ত্রিক আধুনিকায়নে এক প্রতিরক্ষা বাহিনী মহাপ্রাচীর রূপে সৃষ্টি করে।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

এরপরে আবার আমরা দেখছি লেখক সেই কথাই বলছেন একটু অন্যভাবে–

> চোখের সামনে ভেসে উঠল পত্রিকার হেডলাইন— সর্বহারা দল পাতৌদীকে হত্যা করেছে; সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর বাংলা দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, মহান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, একসময় যুদ্ধ শেষ হতেই সৃষ্টি হল বাঙালির জন্য এক নতুন দেশ, নতুন দিগন্ত; মুছে গেল জাতিভেদ, ধর্মভেদ; সবরকম অকল্যাণ, অমঙ্গল; আলসেমি আর কুসংস্কার; সৃষ্টি হল বুদ্ধিশক্তি ও জ্ঞানশক্তির ভিত্তিতে নতুন সমাজ ব্যবস্থা— ব্রাহ্মণ, শূদ্র, আশরাফ, আতরাফ— সব একাকার।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

এবারে যদি আমরা লেখকের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করি তাহলে কি দেখতে পাই? প্রথমেই আমরা দেখতে পাই একটি বৃহত্তর অখণ্ড 'বাংলা দেশ'। বর্তমানে যে বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি ঠিক সেইটি নয়। তারপর দেখতে পাই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ও একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি; যেখানে ধর্ম নামক অধর্ম আসর জাঁকিয়ে বসে না, যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় নতুন ও অধিক কার্যকরী হয়। যেখানে আশরাফ আতরাফ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র নামের ভেদাভেদ ঘুঁচে যায়। যেখানে ধন সম্পত্তির সুষম বন্টনে দেশ হয়ে ওঠে সকলের; কেবল কতিপয় সুবিধাবাদীর নয়। যেখানে আলসেমি আর কুসংস্কার আমাদের

কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। দেশ সৃষ্টি হয় বুদ্ধি-জ্ঞান ও জ্ঞান-শক্তির ভিত্তিতে; খালি মিথ্যা আস্ফালন ও ইমোশনে ডুবে না গিয়ে।

এখানে যে দলটির নাম উল্লেখ করেছেন লেখক সে দল শিরাজ শিকদার ও চারুমজুমদারের সর্বহারা দল। যারা সারাদেশে কেবল আতংক সৃষ্টি করেছেন; গোপনে লুকিয়ে থেকে নানা প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে; কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো বড় পরিবর্তন তারা আনতে পারেন নি। এদের একজন নাসিম আহমেদ, সেই মানুষটিকে তিনি সংগ্রামী করে আঁকতে সচেষ্ট হয়েছেন।

নাসিম করাচির সর্বহারা দলের সঙ্গেও যুক্ত হন। যেখানে সর্বহারার আর এক নাম 'ওয়াকার্স ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব'। সর্বহারা দল একসময় মানুষের ভাবনাকে নাড়া দেয়। এই দলটির দর্শন বা মন্ত্র বা গুণ যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো যায় তাহলে কি হতে পারে সেই কথাই বলার চেষ্টা করেছেন লেখক। মনে হয় দেশের পরিবর্তন আনতে সর্বহারা দলের মতো কোনো দলে তিনি আস্থা রাখেন। মনে মনে ভাবি যারা এই দলের প্রতিনিধি তিনি কি তাদের চিনতেন? তিনি কি এই দলের মন্ত্রধ্বনিকে জানতেন? যে সর্বহারা এখন কেবল ডাকাত দল ছাড়া আর কিছু নয়, তাদের অর্ন্তনিহিত গুণাবলীতে তিনি এমন কিছু কি দেখেছিলেন যা দেশের বৃহত্তর কল্যাণে কাজে লাগনো যেত! হয়তো সেই কারণেই এই দলের মন্ত্রধ্বনি এই গ্রন্থটিতে একটি বিশেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হয়তো সর্বহারা দল একটি প্রতীক। সমাজতন্ত্রের প্রতীক। সাম্যের প্রতীক। যাদের কিছু নেই তাদের কথা ভাবতে হবে। তারা সর্বহারা। তারা সবার পিছে, সবার নিচে। এই মানুষেরই দল সর্বহারা দল। তাদেরকেই প্রথম সারিতে তুলে আনতে হবে; না হলে সমস্ত দেশ সমৃদ্ধ হবে না।

এই ধরনের উপন্যাসের প্রাথমিক যে অসুবিধার সামনে পাঠকে পড়তে হয় সে হলো একে কি উপন্যাস বলা যায়, না একে একটি মতবাদের সুচারু দলিল বলা যায়। যেমন আমরা তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' পাঠ করতে গিয়ে এমননি একটি সমস্যায় পড়েছিলাম। যেখানে ঔপন্যাসিক নিজেও একে উপন্যাস বলতে চান নি বলে স্বীকার করেছেন। নতুন দিগন্তের প্রথম খণ্ড পড়তে গিয়ে আমারো সে কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে লেখকের উদ্দেশ্যের কারণে তার উপন্যাসটি কি হারিয়ে গেছে? একি ঠিকমতো উপন্যাস হতে পেরেছে? নাকি নতুন দিগন্তে পৌঁছানোর একটি সোচ্চার চিৎকার ছাড়া এ আর কিছুই নয়। ঠিক এই ব্যাপারে লেখক কি কিছু বলেছেন দেখতে গিয়ে সন্ধান পেলাম তাঁর মন্তব্যের। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন–

> উপন্যাস কিসে উপন্যাস হয়ে ওঠে তা কারও কাছেই সুস্পষ্ট নয়। এর কারণ হয়ত এ যে, কোনও সৃষ্টি কর্মই প্রথাকে অনুবর্তন করতে বাধ্য নয়। প্রত্যেকটি রচনাই অনন্য। তাই কোনও সংজ্ঞায় খুব বেশি দিন একে ধরে রাখা যায় না। নানা বৈচিত্র্যে মানব সৃষ্ট জগৎও ক্রমশই বিপুলায়তন হয়ে ওঠে। তাই আমার লেখা উপন্যাস হয়েছে কী না তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি যা দেখেছি এবং যা অনুভব করেছি তার সঙ্গে আমার কল্পনাকে মিশিয়ে এ জগৎটি নির্মাণ করেছি। বাস্তবের সঙ্গে কি মিললো বা মিললো না তারও জন্য আমার দায়কে অস্বীকার করি। কারণ, সত্য ত আপন অনুভবেই ধ্রুব হয়ে ওঠে।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

তিনি যাই বলুন পড়তে পড়তে মনে হলো আসলে আমি একটি উপন্যাসই পাঠ করছি। মার্কসিস্ট বা সর্বহারার ম্যানিফেস্টো পাঠ করছি না। কিম্বা কোনো দলের উচ্চ চিৎকার শুনছি না। মনে হলো বাংলায় এম. এ. পাশ করতে গিয়ে জানতে হয়েছিলো উপন্যাস কত প্রকার এবং কি কি। সোজা কথায় বলা যায় উপন্যাসের আকার প্রকার ও প্রাণ। সমালোচক প্রথমে চার প্রকার উপন্যাসের কথা বলেছেন। এই চার

প্রকার উপন্যাসকে আমরা এই ভাবে ভাগ করতে পারি— ১. ঐতিহাসিক উপন্যাস; ২. সামাজিক উপন্যাস; ৩. কাব্যধর্মী উপন্যাস; ও ৪. ডিটেকটিভ উপন্যাস। এ ছাড়াও উপন্যাসকে আরো কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন সমালোচক মণ্ডিলী, যেমন— ৫. বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস; ৬, কাহিনী উপন্যাস; ৭. লোমহর্ষক উপন্যাস; ৮. পত্রোপোন্যাস; ৯. আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস; ও ১০. হাস্য রসাত্মক উপন্যাস।

আমরা আবদুর রউফ চৌধুরীর এই উপন্যাসটিকে কি বলবো? ঐতিহাসিক সামাজিক আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস? যদিও আমরা জানি এর কোনো একটি চরিত্র লেখক নিজে নন। এমনকি তিনি স্বপ্ন দেখা নাসিম নামের সর্বহারা নেতাও নন। কেবল তিনি নাসিমের স্বপ্নকে নিজের অন্তরে লালন করেন। তবু তাঁর চোখে দেখা জীবন অভিজ্ঞতার এতো বেশি পরিচয় পাতায় পাতায় আমরা পাই যে, একে সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞায় ফেলেও বলতে পারি এখানে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের ছিটেফোঁটা বর্তমান। অর্থাৎ জীবন অভিজ্ঞতার কথা সুন্দর ভাবে বিধৃত হয়েছে পাতায় পাতায়। আমরা যারা বয়স্ক তারা পূর্ব পাকিস্তানের গল্প জানি। স্বাধীনতা সংগ্রামের গল্প জানি। সর্বহারা দলের গল্পও জানি। তবে মজার কথা এখনো আমাদের উপন্যাসের সত্যিকারের সংজ্ঞা জানা নেই। যেমন ছোটো গল্পের সংজ্ঞা আমাদের জানা আছে, অনেকেই নানা ভাবে ছোটো গল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু ঠিক তেমন ভাবে উপন্যাসের সংজ্ঞা তৈরী হয়নি।

ইংরাজি ডিক্সনারিতে উপন্যাস বা নভেলকে বলে 'Fictitious prose narrative'। এখানে তাহলে আমরা তিনটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি। প্রথম বিষয় কাল্পনিক, দ্বিতীয় বিষয় গদ্য এবং তৃতীয় ধারা বর্ণনা। এ ছাড়া চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা বিন্যাস এসব লেখা নেই ইংরাজি ডিক্সনারিতে। আর একটি ইংরাজি অভিধান বলছে 'False story'। শ্রীশ চন্দ্রের সাহিত্য সন্দর্শনে উপন্যাসের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে যা পেলাম তাকে আমার বেশি বাস্তব বলে মনে হলো। তিনি লিখেছেন কোনো এক বিদেশী সমালোচকের জবানীতে 'No doubt each greatman creates his own- but no novelist has yet created one.' আমার মনে হলো তা হলে তো উপন্যাস হয়েছে কি হয়নি এমন ভাবনার খুব বেশি প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ কোনো কালেই উপন্যাসের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। বোধকরি উপন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। সেইকারণেই আমরা রাশিয়ার বৃহৎ সব উপন্যাস দেখেছি আবার দেখেছি পঞ্চাশ পাতার উপন্যাস। দেখেছি গলসওয়ার্দির 'ফোরসাইথ সাগা' এবং হেমিংওয়ের 'ওল্ডম্যান এ্যান্ড দ্য সি'। কাজেই উপন্যাস ঠিক কত বড় হতে হবে তা যেমন নির্ধারিত করা মুশকিল তেমনি মুশকিল উপন্যাসের সঠিক চরিত্র নির্ণয় করা। চারখণ্ডের শ্রীকান্ত এবং কয়েক পাতার অরক্ষনীয়া এ দুই উপন্যাস একই লেখকের কলমে সৃষ্টি হয়েছে। এবারে তাহলে বলতে হয় আবদুর রউফ চৌধুরী যে উপন্যাসটি সৃষ্টি করেছেন তা একান্তভাবে তাঁর নিজের লেখনী শৈলী থেকে তৈরী। নিজের উপন্যাসের সংজ্ঞায় তিনি তৈরী করেছেন এবং সেই সংজ্ঞাতেই আমরা এই উপন্যাসটিকে ফেলতে পারি। তিনি বলেছেন–

> আমি যা দেখেছি এবং যা অনুভব করেছি তার সঙ্গে আমার কল্পনাকে মিশিয়ে এ জগৎটি নির্মাণ করেছি। বাস্তবের সঙ্গে কি মিললো বা মিললো না তারও জন্য আমার দায়কে অস্বীকার করি। কারণ, সত্য ত আপন অনুভবেই ধ্রুব হয়ে ওঠে।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

এই উপন্যাসের প্রাণ ও স্বপ্নই হচ্ছে চেনা মানুষের অচেনা কাহিনী ও বাস্তব কল্পনা— একটি বিপ্লব, একটি নতুন দেশ, হাজার বছরের বৃদ্ধের অন্তেষ্টিক্রিয়া।

আমরা উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে সচারাচর যা আশা করে থাকি এখানে তার সবকিছুই আছে। এখানে কিছু চেনা চরিত্র আছে। যা আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। এদের মধ্যে ভুট্টো, ভুট্টোর একাধিক স্ত্রী— আমির, নাহিদ, বেনফরত; ভুট্টোর বান্ধবী— সুরাইয়া; ভুট্টোর মেয়ে— বেনজির, নাসিমা; ভুট্টোর আত্মীয়— পাতৌদী, রাজনৈতিক নেতা আয়ূব, খুরো, মুজিবুর রহমান এবং সর্বোপরি সর্বহারা দলের কর্মী— নাসিম, ফারুক, মতিন ও যতিন। যারা নানা সব কার্যক্রমের ভেতর দিয়ে বই শেষ না করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি পেতে দেয় না। আর প্রথম খণ্ড শেষ হওয়ার পর প্রতিক্ষা কখন আমরা হাতে পাবো এর দ্বিতীয় খণ্ড? নবাব পাতৌদি কি শেষ হলেন? তাকে কি খুন করা হলো? কেন খুন করা হবে? তিনি তো ইন্দিরা গান্ধির শান্তিদূতের পায়রা। তাহলে তাকে খুন করা কেন হবে? কাশ্মিরের শর্ত ছেড়ে দিলে তিনি যে সাহায্যের কথা বলেছেন তাতেই সর্বহারা নায়ক নাসিম আহমেদ ও তার দল তাকে খুন করতে চায়। সর্বহারা ইন্দিরাকে চায় না যেমন, তেমনি তারা চায় না ভুট্টো বা মোনেম খাঁকে, তারা চায় বৃহত্তর বাংলা। সে বাংলা কি তৈরী হলো? যে বাংলায় সবুজ চরের মতো কি জেগে উঠলো একটি নতুন সমাজ? আমরা জানি এমন স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায় না। অন্তঃপক্ষে আবদুর রউফ চৌধুরীর গ্রন্থে কি তা রূপ পেলো? আর এই কৌতূহল ধরে রাখার কারণে আবদুর রউফ চৌধুরী সার্থক। কারণ তিনি আমাদের কৌতূহল কেবল জাগিয়েই দেননি তাকে ধরে রাখতে সমর্থ হ'ন এবং আমরা এর পরে কি হবে তা জানতে উদগ্রিব হই।

প্রথম খণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে আমি দাঁড়িয়ে আছি আসলে হিমালয়ের মতো বড় আদিগন্ত এক স্বপ্নের সামনে। যে স্বপ্ন কেবলই কি স্বপ্ন! আমরা যা করতে পারি না লেখকের কলম কি তা করতে পারেন? তাই জানতে অধির প্রতিক্ষা করছি কখন হাতে পাওয়া যাবে নাসিমের স্বপ্নের দ্বিতীয় খণ্ড। কিন্তু মনে হয় বইটির ট্রিলজি হওয়ার প্রয়োজন। কারণ দু'খণ্ডে হয়তো সব কথা বলা যাবে না। এখানে যে কাহিনী তা আমাদের জানা, অজানাও বলা যাবে। আমরা কবে কখন ভুট্টোর বাড়ির অন্দর মহলে গেছি? কবে কখন সিন্ধুর সেই জমিদারীতে গেছি? যেখানে সাধারণ মানুষ বিয়ের রাতে বউকে কাছে পায় না। তাকে যেতে হয় 'নথিয়া উৎরাণোর' মতো পূন্যকর্মে জমিদারের কাছে। যেখানে চাষাভুষো আমাদের চেনা। কারণ অত্যাচারি ও অত্যাচারিতের চেহারা সারা পৃথিবীতে একরকম। আফ্রিকার নির্যাতন এবং যে কোনো তৃতীয় বিশ্বের নির্যাতন একই রূপরেখায় অভিন্ন। আফ্রিকাও তৃতীয় বিশ্ব। তবু এই জনপদে লেখকের হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে আমরা নতুন অনেক কিছু জানতে পারছি। আমরা এইসব ভয়াবহ প্রথাতে শিউরে উঠছি। ভাবছি এই জঘন্য প্রথা কখন অবলুপ্ত হবে। যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা তারা কি পারেন না এমনি সব বিধি ব্যবস্থাকে শুধরে নিতে, ঠিক করে নিতে। উত্তর— না। কারণ যাদের হাতে ক্ষমতা তারা সকলেই লারকানার জমিদার না হলে অমনিই কেউ। সর্ষের মধ্যে যদি ভূত থাকে তাহলে ভূত তাড়াবে কে? কেবল নাসিমের মতো একজন এবং কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধু কতখানি পরিবর্তন আনতে পারে সমাজে? আবার যে নাসিম মানবিক দুর্বলতার কারণে মাঝে মাঝে শিকারীকে হাতে পেয়েও কিছু করতে পারছে না। আমরা জানি নাসিম আসলে সেই মানুষ যার হৃদয়টি এখনো এই সব সংগ্রামের জন্য কঠিন হয়ে উঠতে পারেনি। এবং সে কি আরো কঠিন হতে পারবে এমন প্রশ্নও জাগে মনে। নাসিম আহমেদ কোনো কোনো দৃশ্যে বিচলিত হয়। বশহীন হয়। তখনই আমরা ভাবতে থাকি তাকে আরো বেশি 'সিজন্ড' হতে হবে। তাকে আরো বেশি সংগ্রামী হয়ে উঠতে হবে কেবল আবেগপ্রবণ বিদ্রোহী নয়। না হলে সে সংগ্রাম করবে কি করে শেষ পর্যন্ত? কি করে আমাদের জন্য এনে দেবে এক নতুন দিগন্ত?

এবারে দেখা যাক এই রচনার সময়কাল। কখন তিনি ভাবছেন এক বৃহত্তর 'বাংলা দেশ'-এর কথা কিম্বা বাংলার কথা। এই রচনার প্রথম পরিকল্পনা ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সন। কিন্তু তারপর নানা কারণে খসরা বা লেখার ব্লুপ্রিন্ট গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারেনি; বেশ কিছু সময় নিয়েছে। নানা প্রকার রদলবদল, গ্রহণ

বর্জনের পরে এই উপন্যাসটি আমরা পেয়েছি। আর এই ১৯৬৮ থেকে ১৯৬৯ সন যে কোন সময় পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের জন্য তা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনে ও শোষনে নিষ্পেষিত, তারা মনে মনে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে তখনই আবদুর রউফ চৌধুরী একটি গ্রন্থের খসরা করছেন। যেখানে পাকিস্তানের বড় বড় নেতার চেহারা কল্পনা করছেন, মনে মনে আর ভাবছেন এদেরকে চরিত্র বানিয়ে তিনি একটি উপন্যাস লিখবেন। যেখানে ইতিহাস ও কল্পনার মিল হবে, এবং তাঁর স্বপ্ন যুক্ত হয়ে একটি ত্রিকোণ উপন্যাস তৈরী হবে। কখনোই নির্যাতিতের কোনো স্বতন্ত্র নিবাসভূমি থাকে না সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই কারণেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক, হতদরিদ্র সকলেরই চেহারা ও গাঁথা একই প্রকার। জমিদার আর প্রজার চেহারাও ভিন্ন নয়। যেখানে এক মোহররম মাতমে ফারুক এসে যোগ দেয় নাসিমের সঙ্গে। এই ফারুক করাচির সর্বহারার জন্য সংগ্রাম করে। যেখানে পারভেজ ওদের দলের একজন। তাঁরা সংগ্রাম করে এই স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে, শেকড় শুদ্ধো মূল শুদ্ধো সমাজের পচে যাওয়া গাছটিকে উৎপাটিত করতে। সাধারণ মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কষ্টের কথা ও সংগ্রামের কথা বলছেন লেখক, ভাবছেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংগ্রাম করে যে দেশ অর্জন করবে সে দেশ দেখতে কেমন হবে? তাঁর মতে সে হবে বৃহত্তর 'বাংলা দেশ'। দেশ বিভাগ কালে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যে ভুল করেছে ব্রিটিশরাজ তাকে চিরকালের মতো ঠিক করে একটি দেশ গড়ে উঠবে। বাঙালির মিলনবন্ধনে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় জন্ম নেবে একটি নতুন দেশ। আর শোষিতের চেহারা যাবে বদলে; তারা হবে সত্যিকারের মানুষ। তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে সেই কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য মানব উদ্দেশ্যে।' কাজেই যাদের হয়ে কথা বলবার সত্যিই কেউ নেই সেইসময়ে তিনি তাদের নিয়ে ভাবতে শুরু করেন এবং সেই ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করে যান তাঁর অমর উপন্যাস 'নতুন দিগন্ত'-এ। কেবল একটি দেশ নয় আনতে হবে সর্বস্থরে মানবমুক্তি। কাজেই লেখার পটভূমি প্রথম খণ্ডে পশ্চিম পাকিস্তান হলেও যাদের জন্য তিনি নতুন দেশের কথা ভাবছেন তারা বাংলার মানবেতর মানুষ। যারা মানব হয়ে উঠতে পারছে না কতিপয় দানবের কারণে। এই দানবপ্রধান তাঁর মতে ভুট্টোর মতো মানুষ। ভুট্টো আসলে শোষিতের প্রতিনিধি। যাদের বিষয় আশয় সম্পত্তির লোভে হারিয়ে যায় সকল প্রকার শুভ অশুভ বোধ। আসলে প্রতিটি চরিত্রই এখান প্রতীক। যেমন প্রতীক লারকানার জমিদারি ও সেখানকার অত্যাচারিত, অবহেলিত, জর্জরিত মানুষ।

এখানে আর একটি বিষয় লেখক উল্লেখ করেছেন যে, যুগে যুগে নির্যাতিত নারীর কথা। যে নির্যাতিত নারীর ভেতরে গ্রামের সেই সব নারীরা এসেছে যাদের জীবনযাপন পুরুষ শাসিত সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের খেয়ালে। যারা বিয়ের রাতে স্বামীর কাছে না গিয়ে ভোগ্য হয়ে ওঠে জমিদারের। এমনকি এস নারীদের যারা বাপের আদেশে গ্রহণ করতে হয় বয়সের চেয়ে ছোট এক স্বামীকে। সেই নারী যার নাম আমির বেগম। এই আমির বেগমকে ভুট্টো তুলনা করেন বিবি খাদিজার সঙ্গে এবং তাঁর ঠাট্টাই সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে। আমির বেগম ভুট্টোর প্রথম স্ত্রী, দ্বিতীয় স্ত্রী নাহিদা, তৃতীয় স্ত্রী বেনফরত, পরস্ত্রী সুরাইয়া সকল নারীই যন্ত্রণার পথ বেয়ে চলে যাচ্ছেন কোনো এক দুর্মর ক্যালডিস্যাকের দিকে। যেখানে পথ চলায় যোগ দিয়েছে বাড়ির পরিচারিকার দল। আমির বেগম কেবল বাপের ইচ্ছার কারণে ভুট্টোর স্ত্রী হন। পুরুষশাসিত সমাজের করুণ বলি। ভুট্টো তাকে বিয়ে করেন কেবল তার জমিদারি বৃদ্ধি করতে। তারপর ভুট্টোর অহেলায় এই আমির বেগম দিন কাটাতে থাকেন। দেশ কাল পাত্র ভুলে আমরা সকলেই আমির বেগমের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে পড়ি এবং ভুট্টোকে অনেক বেশি অপছন্দ করি।

কথা বলতে বলতে লেখক চলে যান অতীতে। যেখানে ভুট্টোর বংশ পরিচয় দেন তিনি আমাদের। সিন্ধুর আদি কথা, রাজা দাহির, মুহম্মদ বিন কাসিম প্রমুখের কথা। তারপর আবার ফিরে আসেন বর্তমানে।

আমরা ট্রেনের কামরায় একটি অসহায় নারীর দুঃখ অবলোকন করি। তিনি বলেন, 'এক সংক্রামক ব্যধির মতো অদৃঢ়চিত্ত ও দুর্বল আত্মার পুরুষের দ্বারাই নারী ধর্ষিত হয়।' এই ভাবে অনেকবার লেখক নারী নির্যাতনের কথা নানা ভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন। শুধু গরীব চাষাভুষোর মেয়েরা নয় যারা বিত্তবান কিন্তু নানাভাবে নির্যাতিত তাদের কথাও বারবার বলেছেন তিনি এবং সেই কারণেই এ গ্রন্থপ্রণে তাকে আমরা অধিক পছন্দ করি। যারা মেকআপের আড়ালে ঢেকে রাখে মুখের কষ্টের বিভিন্ন রেখা ও রং। কাজেই নবদিগন্তে অনেক কিছুর সঙ্গে নারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এই কামনাও তিনি করছেন এবং এমনি একটি বিষয়ে ভাবনা করতে বলছেন। আমরা পড়তে পড়তে ভাবনা করছি। বই বন্ধ করে ভাবছি আমরাও তো পরিবর্তন চাই। আমরাও অগনিত মানুষের ও নির্যাতিত নারীর মুক্তি চাই।

চরিত্র চিত্রণে তিনি সেই সব মানুষদের এনেছেন যাদের আমরা চিনি। কাজেই ধীরে ধীরে কোনো চরিত্রের বিকাশ বা প্রকাশ আমরা দেখি না। তাঁরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই মতো। এমন কোনো ঘটনা বা চমক তিনি আনেন নি যাতে পরিচিত জন অপরিচিত হয়ে যায়। আমরা দেখি সেই সব মানুষদের যাদের নাম শুনলেই তাদের একটি বিশেষ আসনে বসিয়ে দিয়ে আমরা তাদের অবলোকন করি। নবদিগন্তে লেখক যে একমুঠো কুশীলবকে বেছেছেন তাদের চেহারা আমাদের কল্পনার সঙ্গে মিলে গেছে এবং নাটকের সঙ্গে সমান পা ফেলে তারা হেঁটেছেন এবং একসময় তাদের সকল পরিচয় আমাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তারা যদি পরিচিত না হতেন তাহলে কি হতো? তাহলে ঔপন্যাসিকের কল্পিত নতুন কিছু চরিত্র আমাদের সামনে আসতো। একটি 'ফল্‌স স্টোরি' সৃষ্টি করতে। যারা সমাজের, জীবনের, সম্পদের, লাম্পট্যের, ভণ্ডমির কারণে জীবন্ত হতেন। তিনি শেক্সপিয়ারের কুশলতাকে আয়ত্ত করেন নি। অন্তত এই উপন্যাসে নয়। বলা যাবে না তাই ঈশ্বরের চাইতে অধিক বৈচিত্র্যময় চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি শেক্সপিয়ারের পদাংক অনুসরণ করেছেন। কিন্তু সমাজে যাদের চরিত্রে বৈচিত্র্যের শেষ নেই তাদেরই উপন্যাসের কারণে ব্যবহার করেছেন। সেই কারণে এরা সব চেনা। চেনা চরিত্র বলে ক্ষতি হয়নি তার কারণ লেখায় যে বাণী তিনি আমাদের কাছে তুলে ধরতে চান তা এক নতুন সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ গড়বার। কাজেই এই উপন্যাসে একটু একটু করে পেঁয়াজের খোসার ছাড়ানোর মতো চরিত্র উৎঘাটন করেছেন তিনি সত্যিকার অর্থে চরিত্রচিত্রণ নয়। একে সেই কারণে চরিত্রচিত্রণ সর্বস্ব উপন্যাস বলা যাবে না। বরং বলা যাবে চরিত্র বর্ণন উপন্যাস এবং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার উপন্যাস। যেহেতু আমি কেবল প্রথম খণ্ড পাঠ করেছি কাজেই বলতে পারবো না এই উপন্যাসের প্লট পূর্ণতা পেলো কি পেলো না। তবে আমি জানি উপন্যাসে যেই 'ক্যালডিসাকে' বা অন্তরাত্মার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর পথহাঁটার মানুষজনকে সেখানেই চরিত্রগুলোকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। তারা কি ভেঙ্গে ফেলবে সেই দেয়াল? তাদের পিঠ ফুঁড়ে কি জেগে উঠবে আগুনপাখা? সেসব জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য। এবং আশা করবো তৃতীয় খণ্ডের।

উপন্যাসের সময়, পটভূমি, চরিত্রচিত্রণ আমরা জানলাম। এরপর দেখা যাক লেখক ভাষা ব্যবহারে নতুন কিছু করবার চেষ্টা করেছেন কিনা। তিনি কি উপন্যাসের বিকাশে ও প্রকাশে ভাষাকে বদলে ফেলেছেন সময়, পটভূমি ও চরিত্রচিত্রণের কারণে? এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই মোটামুটি ভাবে চার প্রকারের ভাষার ব্যবহার। যখন তিনি বিত্তবানের আসরে তাঁর ভাষা তখন জড়োয়া, খানিকাংশে বঙ্কিমচন্দ্রীয়। যেমন–

> ভেজানো দরজার ফাঁকে শরৎ বিকালের স্বল্প কাপড় পরিহিতা একখানা চাঁদের উদয় যেন। চাঁদখানি ভারি জোয়ানি। ঢলঢল, আলুথালু রূপ। অপূর্ব স্নিগ্ধমুগ্ধ সৌন্দর্যে ভরপুর। অপরূপা বলা চলে। চাবুকের আঘাতে পাকিয়ে শুকিয়ে উন্নত কুচতট ধারিণী অপ্সরী যেন।

— নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

উন্নত কুচতট ধারিণী পড়তে গেলে বঙ্কিমের কোনো একজন নায়িকার কথা মনে পড়ে যায়। আবার আর এক জায়গায় লেখক বলছেন,–

> পূর্ব-পুরুষের যে ক্রুদ্ধ সিংহের সভাব ভুট্টোর রক্তে সুপ্ত ছিল তা যেন এই নারীর সংস্পর্শে এসে মাথা ঝারা দিয়ে জেগে উঠল। দশমুণ্ড রাবণ যেন সীতার দেহ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মেতে উঠেছে। রমণীর সমস্ত ধনরত্ন যেন ভুট্টোর দেহ-তলে লুটিয়ে পড়েছে। অপরিচিতা তরুণীর ওপর ভুট্টোর ঈর্ষা, বিদ্বেষ, আক্রোশ বর্ধিত হচ্ছে। তরুণী যেন অগ্নিকুণ্ডে সীতা! নীরবে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করতে লাগলো সমস্ত দেহ দিয়ে।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

এমনি ভাবে পরিবেশ ও ঘটনার পরিবর্তনে তিনি বারবার ভাষাকে পরিবর্তিত করেছেন। যখন নাসিম ও ফারুক কথা বলছে কিম্বা তাদের চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে তা বলতে গিয়ে তিনি ভাষার চেহারা বদলে দিয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বদলে দেন নি। সেখানেও কিছু ক্লাসিক ভাষা আমাদের চোখে পড়বে। বিশেষতঃ যখন তিনি কোনো কিছু বর্ণনা করেন। তবে এর মধ্যে আটপৌরে ভাষাও চোখে পড়ে। মুখের ভাষা, সাধারণের ভাষা। যেমন–

> সঙ্কীর্ণ গলিপথে ট্যাক্সি আর এগুতে পারছে না। চারজনই নেমে পড়ল একটি ছোট দোকানের সামনে। ফারুক পথপ্রদর্শক। নাসিম পেছন পেছন চলছে, যতিনের সঙ্গে আলাপ করে; কলকাতার চলতি সংবাদ নিয়েই তাদের আলাপ চলছে। অলিগলি ঘুরে তারা মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌঁছে গেল ৪৭ নম্বর ইউনিটের ১৪ নম্বর প্লাটে। দালানের বাইরে ঝোলানো একটি সাইবোর্ড চোখে পড়ল নাসিমের; ইংরেজিতে লেখা— 'ওয়াকার্স ফ্রেণ্ডস্ ক্লাব'।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

এরপর আমাদের আর জানতে বাকি থাকে না এইসব মানুষজন কে বা কাহারা। আর একটি কৃত্রিম ভাষাকে তিনি ব্যবহার করেছেন পরিচারিকাদের ভাষা হিসাবে। প্রথমে আমার মনে হয়েছিলো এই কাজটি কেন তিনি করলেন। কারণ জানতে খুব বেশিদূর যেতে হলো না। আমরা বুঝতে পারলাম এমন একটি কাজ তিনি করেছেন যাতে এই বোঝাতে চেয়েছেন যে, এইসব পরিচারিকা এসেছে কেবল ভিন্ন শ্রেণী ও সমাজ থেকে, নিম্নতর সমাজের শুধু নয়; তাই তারা কথা বলে ভিন্ন ভাষায়। যদিও তারা পাকিস্তানের পরিচারিকা হয়তো দেহাতি উর্দুতেই কথা বলে থাকে; কিন্তু তিনি সেই দেহাতি উর্দু বোঝাতে দেহাতি বাংলা ব্যবহার করেছেন। অন্তার ও লালফিতেওয়ালিনী যখন কথা বলে তাদের ভাষা লেখক বদলে দেন। বুঝতে পারা যায় আমাদের সমাজের ভাষা ক্লাস সিসটেমে কতখানি বদলে যায়। প্রভু আহার করেন, মনিব খান আর চাকর গেলেন। যেখানে আপনি, তুমি ও তুইও যথেষ্ট নয়। কেউ কেউ মনে করেন আপনি ও তুমির মাঝখানে 'তুপনি'র মতো আর একটি সম্বোধন প্রয়োজনীয়। লেখক তাকে পছন্দ করেন না। আমরাও না। যখন আমরা দেখি এক ইউ দিয়ে কত কিছু করে ফেলছেন ইংরাজি ভাষার মানুষ। যে ভাষায় অহেতুক ক্লাস সিসটেমের বাড়াবাড়ি নেই।

এরপরে আছে পাকিস্তানের উর্দু ভাষা। যে ভাষা রপ্ত করতে নাসিম আহমেদ বদ্ধ পরিকর। কারণ চোস্ত উর্দু না জানলে কাজ হাসিল হয় না। আর এই প্রসঙ্গে উর্দু ভাষার ব্যবহার ও পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও প্রতিবাদের কথা আছে।

এই গ্রন্থ পাঠ করতে গিয়ে পাঠক কিছু নতুন তথ্য ও নতুন মূল্যায়নে সচকিত হবেন। যেমন গান্ধি কেন 'কায়সার-ই-হিন্দ' পদক পেলেন। তার একটি ব্যাখ্যা এই প্রকার— তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি তাই ব্রিটিশ রাজ খুশী হয়ে তাকে এমন একটি উপাধিতে সমৃদ্ধ করেন। আবার কায়দে আযম যখন বড়লাটের কাছে স্বাধীনতার জন্য আবেদন পত্র পাঠান তিনি সেখানে বাংলাদেশের কথা বলেন নি। কারণ পুরো নাম পাকিস্তান শব্দের মধ্যে বাংলাদেশের নাম গন্ধ নেই। এসব ব্যাপার আমি ইতিহাস বিশারদের উপর ছেড়ে দিতে চাই। তবে এই সব ছিটেফোঁটা খবর আমাদের বড় ইতিহাসের দিকে ধাবিত করে। যেমন ইতিহাস বিশারদ খুঁজে বের করবেন মুহম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে আসার আগে সেখানে সত্যিই মোসলমান জনগণ বসবাস করতেন কিনা; কারণ আবদুর রউফ চৌধুরীর মতে করতেন। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে এমনি ভাবে সাধারণ পাঠক প্রশ্নবান হতে পারেন।

সেই কারণে এ গ্রন্থের একটি আকর্ষণীয় দিক এই সব ইতিহাসের খবর। সিন্ধুর রাজা দাহির, বোম্বের পার্সি সম্প্রদায় এমনি নানা বিষয় আমরা উপন্যাসের পাতার ফাঁক ফোঁকোরে খুঁজে পাই। যখন সাধারণ মানুষ কথা বলেন তারা নানাবিধ ইতিহাস প্রসঙ্গ তুলে এনে আমাদের ভাবতে বলেন। আরো একটি মজার ব্যাপার মাঝে মাঝে নানা সব গল্প প্রধান খাবারের আচারের মতো বা সসের মতো আমাদের রসনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই প্রসঙ্গে পাঠানদের গল্পগুলো মনে পড়ে। বেশ কয়েকটি মজার গল্প তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। এখানে আবেগের ভাষা, বিদ্রোহের ভাষা, কামনার ভাষা, যৌনতার ভাষা, সংগ্রামের ভাষা সবকিছুই মিলেমিশে ভাষাকে গতিময় করেছে। একটি দ্রুতগামী ট্রেনের মতো ভাষা উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

তবে আমার সব চাইতে ভালো লেগেছে ঔপন্যাসক যখন তাঁর লেখায় অন্যায় ও অবিচারের কথা বলেন। সেইখানেই তাঁর দ্রোহী সত্তা পরিস্ফুট, ভাষা বল্লমের মতো শানিত। আমি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমার কথার সততা প্রমাণ করতে চাই।

এক–

> কালস্রোতে ভেসে গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী, কিন্তু হায়! সিন্ধুদেশে কোনও রদবদল হল না; আসতে দিল না শাসকগোষ্ঠী তথা সিন্ধুর জমিদার শ্রেণী। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা যেমনি নিজের প্রয়োজনে একশ্রেণীর অসহায় মেয়েগুলোকে টেনে এনেছে এরকম এক ভয়ানক আশ্চর্য দেহ-কাটনির কাজে তেমনি স্বনির্ভরতার মত নিপাট বাস্তবতার প্রয়োজনের খাতিরে ফের নতুন করে অন্যরকম রূপে দেহকে সাজিয়ে, রাঙিয়ে, সুগন্ধিত করে নতুনভাবে পুতুলনাচে সামিল হয়েছে সাধারণ ঘরের সিন্ধুর জোয়ানিবৃন্দ।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

দুই–

> পল্লীবাসী প্রজার ভাগ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সিন্ধুপ্রদেশ শুধু পরিবর্তন হয় আমীরবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদে, সাম্রাজ্যবাদ থেকে পুঁজিবাদে; এমনকী ইসলাম নিষিদ্ধ বহু আদি প্রথাও বহাল থেকে গেল আপন ভোগলালসার চরিতার্থকরণ মানসে, যেমন সাধারণ শ্রেণীর নববধূর সঙ্গে জমিদারের প্রথমরাত যাপন; এধরণের প্রথা আজও বিদ্যমান, প্রথমরাত যাপনে অধিকার রয়েছে স্থানীয় জমিদারের তথা শোষকশ্রেণীর।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

তিন–

> শাশুড়ির দাপটে স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা ভারতবর্ষের মেয়েঝিদের মধ্যে অতি পরিচিত। নারীকে সর্বরকমভাবে অত্যাচার করা অজানা নয় ভারত উপমহাদেশীয় পরিবারে; আর নারী নির্যাতনের ব্যাপারে, বিশ্বের সব সমাজব্যবস্থাই, নারীসম্প্রদায়কে ব্যবহার করে আসছে নারীর বিরুদ্ধে।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

চার–

> বিয়ের আগে বাবার সেবা; পরে শ্বশুরের শুশ্রূসা, সতীনের ঈর্ষা, শাশুড়ির গঞ্জনা— সারা জীবনই যেন এক বিরাট বঞ্চনায় ভরপুর।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

পাঁচ–

> ১৯৫০ সনে কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকা লিপ্ত হওয়ায় যুদ্ধের তীব্রতায় পাটের চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। যদিও পাট পূর্ব-বাংলার সম্পদ, তবু পাট বিক্রি-লব্ধ-অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে করাচির উন্নয়নে; সারা দেশের রাজধানী ছিল গতিকে জাতীয়তাবাদী বাঙালির আপত্তি উপেক্ষিত হল। বাঙালি পাটচাষীর মেহনতের ফসল করাচির ব্যবসায়ীমহল ভোগ করছে। সুরম্য অট্টালিকার কী সুন্দর বাহার! .... পাটের সেরকম চাহিদা আর নেই দুনিয়া জুড়ে। অ্যামেরিকার ফ্যাক্টরিতে তৈরি হচ্ছে নকল পাটজাত দ্রব্য। .... ব্রিটিশ রাজত্বের শুরুতে ঢাকার মসলিন কাপড় প্রস্তুতকারী তাঁতিদের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে ফেলা হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর আদেশে, যাতে ঢাকার মসলিন শিল্পের রপ্তানীবাণিজ্য বিনষ্ট করা হয়; ব্রিটেন থেকে আনা সস্তা দ্রব্যাদি বাজারজাত করার উদ্দেশ্যে; এরসঙ্গে এদেশের সম্পদকে সুপরিকল্পিতভাবে লুণ্ঠন করতে থাকে তারা। .... কোম্পানি আমল থেকেই শুরু হয় বাংলাদেশের তাঁতি সম্প্রদায়ের ওপর ইংরেজের আঘাত; মূলকারণ— তারা জানত যে, বাঙালি নিম্নবিত্তসমাজের একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ই হচ্ছে তাঁতিসমাজ। .... ১৭৯৯ সালে বৃহত্তর বাংলার রপ্তানীদ্রব্যের মূল্য ছিল ১২ লাখ টাকা; অথচ ১৮১৩ সালেই তা কমিয়ে মাত্র সাড়ে তিন লাখ টাকায় পরিণত করা হয়। বিলেতে ঢাকার মসলিন রপ্তানী ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ-সময়ে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিশাবে ঢাকার কোনও গুরুত্বই আর রইল না। ১৮৫৪ সালের মধ্যেই ঢাকার মসলিন শিল্পের উন্নয়ন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলে বাঙালি নিম্নবিত্তসমাজের মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড অবনতি ঘটে।
>
> — নতুন দিগন্ত, প্রথম খণ্ড।

এমনি ভাবে অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরে আমি আমার ভালোলাগা বোঝাতে সচেষ্ট হতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় তার কোনো প্রয়োজন নেই। যিনি এই গ্রন্থটি পাঠ করবেন তিনিই লেখক-মানস দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখতে পারবেন। কোনো আড়াল অবডাল বা ঘেরাটোপ নেই তাঁর লেখায়। যে বৃহত্তর বাংলা একদিন ব্রিটিশ রাজের শাসনে শ্মশান হয়েছিলো, যারা এখন বিচ্ছিন্ন তাকেই তিনি একসঙ্গে গেঁথে দেন মালার মতো। যে বাংলার মুর্শিবাদের জৌলুস দেখে চোখ ছানাবড়া হয়েছিলো রবার্ট ক্লাইভের আর ঢাকার চেহারায় ভেবেছিলেন একে শেষ করতে হবে আমাদের স্বার্থে। শেষ করতে হবে মসলিন ব্যবসা। যাদের তারা নীলচাষ করতে বলেছিলেন, যাদের সম্পদ জাহাজ ভর্তি হয়ে পৌঁছে গিয়েছিলো

ব্রিটেনে তাদের সকলে মিলে কেন একটি দেশ গড়বে না। কেন তাঁরা একত্রিত হবে না? এই তাঁর নতুন দিগন্তের স্বপ্ন।

১৯৬৮ থেকে ১৯৯০ সালের পর যখন এই পান্ডুলিপি গ্রন্থ আকারে বাজারে এলো তখন তার মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। কাজেই প্রথম দিকে যে ভাবনা থেকেই এই উপন্যাসের জন্ম হোক না কেন আমরা জেনেছি তাঁর লেখায় অনেক কিছু বাদ দেওয়া হয়েছে, অনেক কিছু বদলানো হয়েছে। এই সেই কারণে গ্রন্থটিতে তথ্যের উপাদান একটি নির্দিষ্ট পথে উপন্যাসকে ধাবিত করেছে। বাহুল্য ঝরে গেছে। শাখা প্রশাখা কমে গেছে। গাছটি বেড়ে উঠছে আকাশ স্পর্শ করতে। চুম্বকের মতো ঋজু কাহিনীতে লেখক একসময় পৌঁছে যাবেন নতুন দিগন্তের কাছে। যদিও আমরা জানি দিগন্ত চিরকালই ছাব্বিশ মাইল দূরে, চিরকালই ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। তবু তিনি উপন্যাসের যে দিগন্ত ধরে ফেলবেন বলে ভাবছেন তাকে তিনি ফোঁটা ফোঁটা লেখায় আমাদের খুব কাছে এনে দেবেন এ বিষয়ে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। এরপর জানতে হবে নাসিম ও নসিমার সম্পর্ক, ভুট্টোকে কি কিছুতেই শাস্তি দেওয়া যায় না, শান্তি চুক্তির পাতৌদি কি এমনি ভাবে সংগ্রামীর হাত ফসকে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকবেন, গণমানুষের মুক্তি নামক গালভরা বুলি কি সত্য হবে, বৃহত্তর বাংলার কারণে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলা কি দু'জনে দু'জনের আরো কাছে চলে আসবে? অগনিত নির্যাতিত নারী কি আর একটু মর্যাদাকর জীবনে উন্নীত হতে পারবেন? এবং আরো যে সব স্বপ্ন দুই লাইনের মাঝখানে আটকে পড়ে আছে কি হবে তাদের?

সালেহা চৌধুরী

সাহিত্যিক ও কবি, লন্ডন।